Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	October 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v32i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.1
Pages	1-39
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ

সৈয়দ আলী আহসান

এক

[‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ থেকে ‘কড়ি ও কোমল’]

‘সঞ্চয়িতা’ সংকলন গ্রন্থের সূত্রপাত হয়েছে “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র দু’টি কবিতা দিয়ে—একটির নাম ‘মরণ’ এবং অন্যটির নাম ‘প্রশ্ন’। ১৮৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ ছাপা হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম—‘গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে’ লিখিয়া ভারি খুশী হইলাম।” রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, স্বরচিত এই চরণটির ধ্বনি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং এটা লিখে নিজের উপর তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। এই বিশ্বাস জন্মেছিল বলেই ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে কবিতারচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন শৈশব থেকে। এ-কাব্যধারার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বাল্যকাল থেকেই। একটি পত্রে এই অনুরাগ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করতো। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলাম।” যে-বয়সে তিনি বৈষ্ণব কাব্যকে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন সে বয়সটি কোনও তত্ত্বকে গ্রহণ করবার বয়স নয়। তাহলে আমি বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার ছন্দে মুগ্ধ হয়েছিলেন, শব্দগত অনুপ্রাসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় কবির মুগ্ধতা ছিল শব্দের মধুরতা

নিয়ে, অর্থের গভীরতা নিয়ে নয়। 'সঞ্চয়িতা'য় সংকলিত 'মরণ' কবিতাটিতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সেখানে মৃত্যুর মত জটিল প্রশ্নের অনুসন্ধান নেই। কিন্তু শব্দ সাজাবার একটি নতুন প্রক্রিয়া আছে। প্রথম স্তরে একটি সুন্দর অনুপ্রাসের যোজনা আমরা লক্ষ্য করি যেখানে 'ম' ধ্বনিটি স্তবকের প্রথম শব্দ থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত প্রবহমান। ছয়টি চরণের একটি স্তবকের মধ্যে 'ম' বর্ণটি পনের বার এসেছে। এভাবে একটি ধ্বনিকে হিল্লোলিত করে বালক কবি একটি আনন্দিত ঝংকার নির্মাণ করেছিলেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-এর এই কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অস্বীকার করলেও তাঁর কাব্যধারা থেকে এগুলোকে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়নি। আমরা বর্তমানে লক্ষ্য করি যে সঙ্গীত রূপে প্রচারিত হয়ে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' স্থায়িত্ব লাভ করেছে। প্রথম সময় থেকেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র গানগুলোর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। 'সঞ্চয়িতা'য় সংকলিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র দু'টি কবিতা ছন্দের লালিত্য এবং অনুপ্রাসের মাধুর্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারাক্রমের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ দু'টো কবিতার মধ্যে তত্ত্ব যে নেই তা নয়, কিন্তু তত্ত্বগুলো তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। জীবনসংক্রান্ত যে তত্ত্বের কথা তিনি এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন তা শব্দের আনুকূল্যে সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করতে পারেনি। গৃহে পিতার আচরণ এবং বিশ্বাসের প্রকাশের মধ্যে যে ধর্মজিজ্ঞাসা স্ফুরিত হত তারই প্রভাব অস্পষ্টভাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেছিল, তারই প্রমাণ এই দু'টি কবিতায় আমরা পাই। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অনুভব করেছিলেন। সুস্পষ্টভাবে কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি অথবা কোন স্বভাবের প্রকৃতি নয় কিন্তু সাধারণভাবে প্রকৃতির প্রতি সম্মান এবং সমর্থন কবিতা দু'টির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। বর্ষা এবং বসন্ত—এ-দু'টি ঋতুর পটভূমি কবিতা দু'টিতে আছে। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ-দু'টি ঋতু প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এখানকার কবিতা দু'টিতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের ঋতুমঙ্গলই এসেছে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঋতু-বিবেচনা ধরা পড়েনি। আরেকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং বাক্যবিন্যা-সের ক্ষেত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পুরোপুরি ব্রজবুলির ভাষায়

লিখিত নয়। কবিতাগুলোর মধ্যে বাংলা চরণবিন্যাস সুস্পষ্ট এবং বাংলা শব্দের উচ্চারণও সুস্পষ্ট রয়েছে। কিন্তু তবুও বালক কবির সাহসিকতার প্রশংসা করতে হয়। তিনি ক্ষণমাত্র বিচলিতবোধ না করে বিনা দ্বিধায় শুধুমাত্র ধ্বনির বিমুগ্ধ আবর্তের সাহায্যে এ পদগুলি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'প্রেমপূর্ণ তণু পুলকে ঢলঢল' 'তৃষিত আঁখি তব', মধুর পরশ তব', 'হৃদয় কমল তব চরণে টলমল'—এগুলো পুরোপুরি বাংলা এবং কোনক্রমেই ব্রজবুলির সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করে না। কিন্তু দুঃসাহসী বালক কবি এই মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং মিশ্রণটি পাঠক বা শ্রোতার কানে খারাপ লাগে না।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমেদাবাদে যান। সেখানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে তরুণ কবি বোম্বাইতে যান। বোম্বাইতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী চালচলন ও কথাবার্তা শিক্ষা করেন। বোম্বাইতে যে গৃহে তিনি অবস্থান করেছিলেন সে গৃহকর্তার কন্যার সঙ্গে তাঁর আনন্দসম্ভাষণ ঘটে। বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে যান। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সতের বছর পাঁচ মাস। বিলেতে অবস্থানকালে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' দিয়েছেন। বিলেতে অবস্থান কালে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে বিশেষ করে বার্নস-এর গানের সুরমাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতার পরিচয় তিনি প্রদান করেন দেশে ফিরে এসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার মধ্যে। বার্নস-এর সুরের সমোহন রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পর্যন্ত চঞ্চল রেখেছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সময় থেকেই তিনি প্রচুর গান লেখেন। পরবর্তী দু'টি কাব্যনাট্যে এই গানের প্রশ্রয় আছে। কাব্যনাট্য দু'টির নাম 'রুদ্রচণ্ড' ও ভগ্নহৃদয়'—এগুলো রবীন্দ্র-কাব্যধারায় কাব্য হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু সঙ্গীতের দায়ভাগের দিক থেকে এগুলোর উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। 'সঞ্চয়িতা সংকলনে' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'রুদ্রচণ্ড' এবং 'ভগ্নহৃদয়' স্থান পায়নি, যেটি স্থান পেয়েছে সেটি হচ্ছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশিষ্ট কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগলো।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুকরণের পর্ব চলছিল। তিনি 'ব্রজবুলি'কে অনুসরণ করেছিলেন এবং বিহারীলালকে অনুকরণ করেছিলেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-এর পরে যা কিছু লিখেছিলেন তা ছিল আখ্যানমূলক কাব্য, অনুভূতিপ্রবণ কাব্য নয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ এই প্রথম কবি আপন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর কবিতাগুলোর মধ্যে শব্দব্যবহারে এবং অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে অপরিণত ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেলেও একটি তন্ময়তা যে রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন তার প্রমাণ এ-কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়। বিহারীলালকে তিনি পুরোপুরি ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। বিহারী-লালের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাব 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতাগুলোর মধ্যে আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো কাব্যধারার বন্ধনদশা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা এখানে পাওয়া যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখছেন, "তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম, জানি না কেমন করিয়া কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।" এই খসে যাওয়ার উপক্রমণিকা হিসাবে আমরা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কে পাই। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর যে কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার নাম 'দৃষ্টি'। এই কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে হৃদয়-নিভৃতে কত কি যে লুকোনো ছিল তা তিনি আগে জানতেন না; কিন্তু একজনের নয়নের দিকে দৃষ্টি-পাত করে তিনি নিজের হৃদয়কে দেখতে পেলেন। এ কথার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রসাবেশ আছে যা আমাদেরকে চমৎকৃত করে। এখানে বিহারীলালের ভাবটি আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাসটি নেই; প্রণয়ের একটি জাগরণ আছে, একটি বিষণ্ণতা আছে, কিন্তু উচ্ছলতা নেই। এই কবিতাটি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। একটি পত্রে এই সময়কার অনুভূতির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেছে, আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে বল দিয়েছে, পুষ্টি দিয়েছে, কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয়নি।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচকিত ছিলেন যেন অনুকরণের প্রকোষ্ঠ তিনি অতিক্রম করতে পারেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' সম্পর্কে

বলা যায় যে এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যা অনুকরণের স্তরে নিমজ্জিত থাকে নি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর সুর বিষাদময়। এই বিষাদ কেন তা সুস্পষ্টভাবে বলা না গেলেও একটি কথা বলা যায় যে যৌবন উন্মেষের লগ্নে বিষাদও প্রেমের একটি উপকরণ হিসাবে উপস্থিত হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যখন তিনি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স বিশ বছরের মত। এ বয়সে প্রেমের রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান কল্পনা করতে ইচ্ছে করে। এ ধরনের মান-অভিমান বা রাগ-অনুরাগ নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কেননা এ বয়সে স্বাভাবিকভাবে কৈশোর অতিক্রান্ত যৌবনে পদার্পণকারী একজন পুরুষ কল্পনায় ভাবব্যঞ্জনা নির্মাণ করতে পারেন। তবে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে হঠাৎ চলে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিতা-গুলো লেখা আরম্ভ করেন। কয়েকটি কবিতার ভাবপ্রকল্প অনুসন্ধান করলে অনুভব করা যায় যে কাদম্বরী দেবী চলে যাবার ফলেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে বিষণ্ণতা সৃষ্টি হয়েছিল এ বিষণ্ণতার ভাব অনেক কবিতায় সুস্পষ্ট।

'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংস্কার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বাহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু জগতের আনন্দরূপের উপর তখনও যবনিকা পড়িয়া গেল না।" 'প্রভাতসঙ্গীতে'র তিনটি কবিতা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে-'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'প্রভাত-উৎসব'। তিনটি কবিতা মূলতঃ নতুন জীবনের জয় ঘোষণা। সূর্য উদয়ের

সঙ্গে সূর্যোকররশ্মিতে উদ্ভাসিত হয় সমস্ত পৃথিবী। সেই উদ্ভাষণের মধ্যে মালিন্য দূর হয় এবং একটি নতুন জাগৃতি জন্মলাভ করে। সব কটি কবিতার মধ্যে নতুন প্রাণের উল্লাসের কথা আছে, জ্যোতির্ময় প্রভাতের কথা আছে, আনন্দের আন্দোলনের কথা আছে। প্রথম কবিতাটিতে কবি একটি রূপকের মাধ্যমে জীবন-জাগরণের প্রস্তাব করেছেন। রূপক হচ্ছে: ত্রিকালদর্শী মহাদেবের জাগরণ, যে জাগরণের ফলে জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হল এবং সর্বত্র আনন্দ কোলাহল জেগে উঠলো। কবি কল্পনা করছেন যে এটা যেন সজীবতার একটি নতুন উচ্ছ্বাস। একই বক্তব্য এসেছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে। এই কবিতাটিতে একটি উন্মাদনার কথা আছে, একটি প্রাণচাঞ্চল্যের কথা আছে এবং প্রবলভাবে বন্ধন উন্মোচনের কথা আছে। উভয় কবিতা-তেই ছন্দের দ্রুত লয় লক্ষ্যযোগ্য, একটি উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই দ্রুত লয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ দু'টি কবিতার মধ্যে কবি হৃদয়ের একটু ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই ব্যাকুলতা নতুন সৃষ্টির ব্যাকুলতা। একটি সৃষ্টি যখন জাগ্রত হয় তখন তার একটি দীপ্তি প্রতিফলিত হয় সমস্ত কিছুর উপর। পৃথিবী তখন অত্যন্ত সুন্দর বোধ হয় এবং একজন কবির জন্য অত্যন্ত আপনার বলে মনে হয়। সমগ্র সৃষ্টিকে আপন করে নেয়ার যে একটা চৈতন্য সেই চৈতন্যের অংকুরোদ্গম 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থেই প্রথম ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিশুকাল থেকে কেবল চোখ থেকে দেখাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, এখন যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখা আরম্ভ হল। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন যে তখন তিনি জগতকে সত্যভাবে দেখেছিলেন। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর উল্লিখিত দু'টি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের যেন ভূমিকা লেখা হয়েছিল। 'প্রভাত-উৎসব' কবিতাটিতে প্রত্যুষের অঙ্গীকারকে প্রকাশ করছে। সূর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ জন্মাবধি। শৈশবে পিতার সঙ্গে যখন হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছেন তখন নব-উদিত সূর্যের মহিমাচ্ছটা তিনি দেখেছিলেন। 'প্রভাত-উৎসব'-এর মধ্যে এই মহিমার কথাই বলা হয়েছে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে কবি বলছেন যে পূর্বের আকাশে সূর্যের রেখা দেখা দিতেই পাখীরা কলরব করে উঠলো, তখন সব কিছুই মধুর মনে হল। এই মধুর অনুভূতিতে তিনি ভাবলেন আকাশ তাকে আহ্বান করছে এবং সেই আহ্বানে সারা দিয়ে প্রভাত-আলোর

মধ্যে তিনি তাঁর প্রাণকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই কবিতাটি অত্যন্ত সরল, নিরাভরণভঙ্গীতে রচিত। কিন্তু এই ভঙ্গীটাই একটি উদ্বেলতা বহন করছে। তাছাড়া এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চলিতভঙ্গীকে ছন্দোবন্ধনের মধ্যে অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। যদিও ক্রিয়াপদের মধ্যে সাধু ও চলিত উভয়ভঙ্গীর দ্বৈততা বিদ্যমান; তবুও বলা যায় এর মধ্যে চলিত ভঙ্গীর একটি আনন্দ এবং চারুতা ধরা পড়েছে।

এ-সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে উপন্যাস, নাম—'বউ-ঠাকুরানীর হাট।' 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' এমন কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নয় কিন্তু এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাংলাগদ্যে একটি সুন্দর পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে চলিতভঙ্গী তখন পূর্ণভাবে ব্যবহার হচ্ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন যে যখন তিনি 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' রচনা করেন তখন অন্তর্বিষয়ী ভাবের চাইতে বহির্বিষয়ী কল্পনা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি আরো বলছেন যে, সে সময় তাঁর লেখনি গদ্যরাজ্যে নতুন নতুন ছবি এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চেয়েছিল।

'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার সময় 'ছবি ও গানের' কবিতাগুলি রচিত হতে থাকে। 'ছবি ও গানের' মধ্যে যে সমস্ত কবিতা ও গান স্থান পেয়েছে সেগুলো মূলতঃ চিত্রধর্মী। একটি চিত্রদর্শনের মত করে জগৎকে কবি দেখছেন এবং রেখাঙ্কনের সাহায্যে সেই চিত্রের যেন প্রতিলিপি নির্মাণ করছেন। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলছেন যে নানা জিনিসকে দেখবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি তাকে যেন পেয়ে বসেছে। কিছুকাল পরে প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সকল বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির

মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক তার মধ্যে, পরিণাম কিছুই ছিল না।”

‘ছবি ও গান’ থেকে ‘সঞ্চয়িতা’য় ‘রাহুর প্রেম’ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে বাসনামদির প্রেমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রেম দেহভিত্তিক এবং স্পষ্ট ও মুখর। যৌবনের যে একটি কামগত মোহগ্রস্থতা থাকে সেই কামজপ্রেমের একটি সুস্পষ্ট আকর্ষণ এবং অঙ্গীকার এই কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে। দেহগত রূপের যে ঐশ্বর্য আছে তার প্রতি কবির একটি দুর্বলতা এবং আবেগ এখানে স্পষ্ট হয়েছে। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় দেহগত প্রেম দেহাতীত রূপব্যঞ্জনা লাভ করে। ‘রাহুর প্রেম’ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলো উপমা নির্মাণ করেছেন যা বাংলা কাব্যক্ষেত্রে একেবারে নতুন। প্রথম উপমাটিতে বলছেন যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব এবং ভাঙ্গা বাক্য যেভাবে বাজতে থাকে সেভাবেই আমার অস্তিত্বের সাড়া তুমি অনুভব করবে। অন্য একটি উপমায় বলছেন আমার স্মৃতি যতই তুমি অস্বীকার করবার চেষ্টা কর না কেন কাঁটার মত তা তোমার পায়ে বিঁধে থাকবে। অর্থাৎ পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকলে ব্যাথার মত তা যেমন সব সময় অনুভব করা যায় আমার স্মৃতিও তেমনি তোমাকে পীড়া দেবে। তৃতীয় উপমাটি হচ্ছে রোগের। রোগগ্রস্থ একজন ব্যক্তি যেমন রোগের যন্ত্রণায় অস্থির থাকে, আমার অস্তিত্বও তেমনি তোমাকে যন্ত্রণায় অধীর করবে। এ-তিনটি উপমা বাংলা কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার দ্বার উন্মোচন করেছে। কবিতাটিতে একটি দুঃখবোধ আছে। ছন্দের ধীরগতিতে সেই দুঃখবোধটি ধরা পড়ে।

‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯০-এর ফাল্গুন মাসে। কাব্যগ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর ভ্রাতুবধূ কাদম্বরী দেবীকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন, “গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসর-কার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।” কাদম্বীর দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা এবং আকর্ষণ এই উৎসর্গপত্রে সুস্পষ্ট। ‘ছবি ও গান’-এর

বিভিন্ন কবিতার মধ্যে কবির মানসী হিসাবে কাদম্বরী দেবীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের তিনমাসের মধ্যে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কেন আত্মহত্যা করেন তা আমরা জানি না তবে এটুকু ঘটনা আমাদের জানা যে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অল্প পরেই এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

'ছবি ও গান' রচনার পরপরই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন এবং 'বালক' নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ। এ দু'টি কর্মকাণ্ড রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন সমাজজীবনের সচেলতার প্রকোষ্ঠে এনে উপস্থিত করেছে।

'ছবি ও গান'-এর পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'। যে দেহগত প্রেমের উন্মেষ আমরা 'ছবি ও গানে' লক্ষ্য করি তারই একটি ভাস্বর প্রকাশ 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে ঘটেছে। 'কড়ি ও কোমলের'-এর মধ্যে দেহগত প্রেমের প্রকাশ থাকলেও তারও বাইরের নানা ধরনের কবিতা এই বইতে আছে। প্রেমের কবিতা ছাড়াও 'শিশু কবিতা', 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এবং 'স্বদেশ সঙ্গীত' আমরা এর মধ্যে পাই। তবে বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও মূলতঃ পূর্ণযৌবনের রসাবেশে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা মণ্ডিত। অনেকগুলো কবিতার মধ্যে যৌবনবতী রমণীর বিকশিত যৌবনই প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য কবিতাগুলো হচ্ছে 'গীতোচ্ছ্বাস', 'চুম্বন', 'বাহু', চরণ', 'হৃদয়-আকাশ', 'হৃদয়-আসন', 'বন্দী'—এই কবিতাগুলোর মধ্যে রমণীর দেহগত রূপৈ-শ্বর্যের প্রতি কবির প্রচণ্ড দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন, "যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তির অতীত—কেবল চক্ষু-কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।" এই ব্যাকুলতার পরিচয়ই আমরা 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় পাই।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পুরোপুরি

চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। বিশুদ্ধ ক্রিয়াপদ শুধুমাত্র একটি আছে—'গাহিল'। চলিত ক্রিয়াপদ শুধুমাত্র নয়, এই কবিতাটিতে কবি তৎসম শব্দকে তরলিত করে প্রাত্যহিক উচ্চারণের মধ্যে সমর্থিত করেছেন। সূয্যি, বিষ্টি, দৌরাত্মি, লেখাজোকা, দাপাদাপি, মিটিমিটি, দস্যি, ইত্যাদি শব্দগুলোর বানান এবং উচ্চারণ লক্ষ্য করবার মত। কবিতাটিতে তৎসম শব্দের অধিকার বিনষ্ট করা হয়েছে এবং দেশজ শব্দের আধিক্যে কবিতাটি বেগবান ও চটুল হয়েছে। আটটি চরণ করে পাঁচটি স্তবকের মধ্যে কবি গ্রামীণ একটি ছড়ার পরিবেশকে সহজলভ্য আনন্দের উচ্চারণের মধ্যে বিলসিত করেছেন। প্রকৃতির অধিকারটা এসেছে অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে। গ্রামীণ ছড়ার রসাবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে কবি বাঙালী গৃহের মমতা, আকর্ষণ, খেলাধূলা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একটি প্রবাহ নির্মাণ করেছেন। সম্পূর্ণ কবিতাটি বাংলাদেশের সুস্পষ্ট গ্রামীণ চিত্রের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রকৃতিকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি তারই স্বভাব কবিতাটির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। এখানে দিনের আলোর শেষে সূর্য ডোবার কথা আছে, আকাশে মেঘের আনাগোনার কথা আছে, সন্ধ্যাকালে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টার শব্দের কথা আছে, ফলের বনের মধ্যে এবং গাছের পাতার উপর বৃষ্টির শব্দের কথা আছে, গৃহস্থ গৃহের মায়ের মমতার কথা আছে। দুরন্ত ছেলের দাপাদাপির কথা আছে। এবং রাত্রিবেলা একেবারে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মায়ের কোলে বসে দুষ্টছেলের গল্প শোনার কথা আছে। সব কিছু মিলে কবিতাটি বাঙালী গৃহস্থ জীবনের এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সুসমঞ্জস সুন্দর চিত্র।

যে কবিতাটি দিয়ে 'কড়ি ও কোমল'-এর সূত্রপাত সেই 'প্রাণ' কবিতাটি একটি সহজ অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রকাশে মধুর। কবিতাটিতে উপমা-রূপকের কোন ঘনঘটা নেই, ব্যক্তব্যের কোন অলংকরণ নেই, একটি নিরাভরণ সততায় কবি তাঁর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছেন। কবি বলছেন যে এই পৃথিবী সুন্দর, এই সুন্দর পৃথিবীতে তিনি মানুষের মধ্যে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে এবং তাদের দুঃখ-সুখ এবং হাসি-আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত থাকলে মৃত্যু তাকে অন্তরালে নিতে পারবে না। কেননা তখন মানুষের প্রাণচেতনার মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন। কবি

মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন একান্ত নিভৃত জীবন কামনা করেন না। তিনি সকলের মধ্যে বেঁচে থাকতে চান। তাই তিনি বলছেন, 'মরতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনা-বেচার বিচিত্র লীলা চলে এরি মধ্যে এই সুন্দর কোলাহলের মধ্যে তাঁর পূজার গীত উঠছে—এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনই তার উৎসব নয়। একটি পত্রে তিনি তাঁর এই কাব্যের মানবপ্রীতি সম্পর্কে লিখেছেন, "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষরূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং অব্যক্তে...মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেজন্যেই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি সাধনা করতে পারি না। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠলো না—কেননা অমরতা তাঁরই মধ্যে যে মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।" বলা যেতে পারে যে 'কড়ি ও কোমল'-এর "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি অবশেষে 'নৈবেদ্য'-এর 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'-এই উচ্চারণে পৌঁছেছিলেন।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ একটি কাব্যযুগের অবসান নির্দেশ করে এবং একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করে। যে যুগের অবসান হচ্ছে সে যুগে আমরা প্রাণচৈতন্যের উন্মেষ দেখতে পাই। উষালগ্নের পরিচ্ছন্নতা এবং মন্দ্রতা আবিষ্কার করি এবং কৈশোর ও যৌবনে রসাস্বাদ মাধুর্য আবিষ্কার করি। নতুন যুগে একটি নতুন অনুসন্ধান এসেছে সে অনুসন্ধানটি হচ্ছে কবিতার ভাব-প্রকল্পের পশ্চাতে যে অন্তর্গূঢ় রহস্য আছে তাকে জানবার চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মানুষের মুক্ত জীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগর-যাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ" কবিকে চঞ্চল করছে।

'পুরাতন' কবিতাটিতে কবি অত্যন্ত সহজ এবং সরল মমতার ভঙ্গীতে পুরাতন দিবসকে বিদায় জানাচ্ছেন এবং নতুন দিনের আগমনকে

স্বাগত জানাচ্ছেন। অনেক পরে আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের জীর্ণতার মধ্যে নতুন জীবনের জয়যাত্রার কথা বলবেন। পুরাতন জীবনের যা কিছু গ্লানি এবং অপঘাত তার অবসান ঘটুক এটাই কবি চান। এই কবিতাটিতে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সাধুভঙ্গী পুরোপুরি ব্যবহৃত হলেও সমস্ত কবিতার মধ্যেও একটি তরল লঘু ব্যঞ্জনা আছে যার মধ্যে আমরা চলিত ভঙ্গী, গতি এবং লয়কে পাই। 'নতুন' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং একটি প্রথাগত রচনা।

সনেটের ভঙ্গীতে লেখা যে বারটি কবিতা এখানে সংকলিত হয়েছে সেগুলোর একটি বিশিষ্টতা আছে। চৌদ্দ চরণের বন্ধনের মধ্যে কবি এক একটি ভাবকে গ্রাহ্য এবং মূর্ত করতে চেয়েছেন। একটি কঠোর সীমাবন্ধনের মধ্যে কোন একটি ভাবকে বিলসিত করা খুবই কঠিন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ এমন কতকগুলো বিষয় বেছে নিয়েছেন যা সংক্ষেপে সিদ্ধতায় আসে। অনেক পরে আমরা 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে এই ভঙ্গীর সদন পরীক্ষা দেখব। 'চৈতালী', 'নৈবেদ্য' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে ভাবকে সন্নিবদ্ধ করে প্রকাশ করার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করব। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' এ-ভঙ্গীর সূত্রপাতের যে সংরাগ তাকে অস্বীকার করা যায় না। এই কবিতাগুলোর মধ্যে শব্দব্যবহার এবং উপমা-রূপক প্রয়োগের ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ কোন নতুনত্ব আসেনি। তবুও এগুলোর মধ্যে যে ব্যাকুলতার জন্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে সেই ব্যাকুলতাই নতুন রূপে এবং ভঙ্গীতে প্রকাশ পাবে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী যখন প্রকাশিত হয় তখন সেখানে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, "যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।...আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোন দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোন একটা কাব্যরীতির বাঁধাপথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুলে ছিলুম।... [বিহারীলালের] প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে

সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাইরের মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।”

‘কড়ি ও কোমল’ প্রকাশিত হয় ‘ছবি ও গান’ প্রকাশের তিন বছর পর বাংলা ১২৯৩ সালে। এই দুইটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ভাবগত মিল আছে—এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উত্তরণের মত। উভয় কাব্যগ্রন্থে একই ভাব-প্রকল্পের ক্রমপরিণতির ধারা প্রকাশ পেয়েছে। ‘ছবি ও গান’-এর মধ্যে যে অস্পষ্টতা এবং কল্পনা ছিল ‘কড়ি ও কোমল’-এ তা বিদূরিত হয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। সে কারণে এই দুইটি কাব্যগ্রন্থ মিলিয়ে পাঠ করা যায়। একটি কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন শব্দ হচ্ছে কবিতার উপকরণ। এই শব্দগুলোর নিজস্ব অর্থগত বন্ধন আছে। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ সেই বন্ধন ভাঙবার চেষ্টা করছিলেন। এ রই প্রথম প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি।

‘কড়ি ও কোমল’ সঙ্গীতশাস্ত্রের শব্দ। গানের মধ্যে কড়ি ও কোমল সুরের কথা আমরা শুনে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ থেকে শুরু করে ‘কড়ি ও কোমল’ পর্যন্ত যতগুলো কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার প্রায় সবগুলিরই নাম গানের সঙ্গে যুক্ত। যেমন ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’, ’সন্ধ্যাসঙ্গীত’, ‘প্রভাতসঙ্গীত,’ ‘ছবি ও গান’ এবং অবশেষে ‘কড়ি ও কোমল’। এ সমস্ত নামকরণের পশ্চাতে একটি তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে যে কবি এ সমস্ত কাব্যের মধ্যে গানের রসাবেশ মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য অনেক সময় সঙ্গীত শব্দটি ব্যাপক অর্থেও ব্যবহার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই ব্যাপক অর্থেই সেই শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, ‘কড়ি ও কোমল’-এর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের একটি আবেগের ধারা শেষ হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি। পরবর্তীতে তিনি নতুন ধারণা ও বিশ্বাসকে নিয়ে অগ্রসর হবেন। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে চৈতন্যোদয় আমরা এই পর্বে লক্ষ্য করি তার পরবর্তীতে তা যথার্থ শিল্পমণ্ডিত হয়ে রূপলাভ করবে।

দুই

[মানসী]

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'মানসী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি যখন পশ্চিম ভারতের গাজীপুরে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর মন নিমগ্ন হয়েছিল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। তিনি তার গানে এক সময় বলেছিলেন যে তিনি 'সুদূরের পিয়াসী'। পরিচিত সংসার থেকে গাজীপুরে তিনি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলেন, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ তা দূর হল এবং মনোরাজ্যে মুক্তি এলো। এই আবহাওয়ায় তাঁর কাব্যরচনার একটি নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উপর নতুন পরিবেষ্টনের প্রভাব সবসময় পড়েছে। 'মানসী'তে আমরা দেখি পূর্বতন রচনা-ধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি নতুন কাব্যরূপের প্রকাশ। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নতুন শক্তি দিতে পেরেছিলেন। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এখানেই প্রথম কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যেন যোগ দিয়েছে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের সূচনার কবিতাটির নাম 'উপহার'। উক্ত কবিতায় তিনি বলছেন যে তাঁর চিত্তের মধ্যে নিভৃত অবস্থানের কারণে নিমেষে নিমেষে জগতের তরঙ্গ-আঘাত বাজে এবং সেই তরঙ্গ-আঘাত হৃদয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মধ্যে কবি সুখ ও দুঃখের গীতস্বর শোনেন। যেখানে শুধু ধ্বনি আছে কোন ভাষা নেই। এই ভাষাহীন ধ্বনি বিচিত্র কলরোল তুলে কবিকে ব্যাকুল করে এবং বিচিত্র দুরাশা জাগিয়ে তোলে। অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে কবির কোন কাজ নেই, তিনি শুধু কাব্যরচনা করে অসীমের সীমাবন্ধনের চেষ্টা করেন। তিনি ভাষা দিয়ে মানসী-প্রতিমা নির্মাণ করেন। এই সমস্ত নিভৃত ভাবনাগুলি বিরহের একটি ব্যাকুলতা চিত্তে নির্মাণ করে। সেই বিরহী ভাবনাগুলি কবিতায় মূর্তিমতী হয়ে ওঠে। 'উপহার' কবিতার এই কথাগুলোতে আমরা 'মানসী' কবিতাগ্রন্থের মূল ভাবপ্রকল্পকে আবিষ্কার করি।

'মানসী'তে যে নতুন পর্ব আপনা থেকেই প্রকাশ পেল তাতে কবির কাব্যকলার অনেকপ্রকার বৈশিষ্ট্য কোন না কোনভাবে প্রকটিত হয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যকে আমরা আবিষ্কার করি কবিতার ভাবরূপে, রূপকল্পে, শব্দে এবং ছন্দে। এইভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, 'কড়ি ও কোমল'-এর পর 'মানসী'তেই রবীন্দ্র-কাব্যের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অকৃতার্থতার বেদনা কবির হৃদয়ের মধ্যে জেগেছে এবং সেই বেদনার মূর্তি তিনি নির্মাণ করেছেন 'মানসী'তে।

আমরা জানি কবিতা কোন না কোন রকম সত্যকে ধারণ করে অথবা সত্যকে নির্মাণ করে। কবিতায় কবিরা বক্তব্যের জন্য এমন একটি বাক্যবন্ধ অনুসরণ করেন যা গদ্যের ব্যবহার থেকে ভিন্ন, এমন একটি রূপকল্প অথবা ইমেজ সন্ধান করেন যা যুক্তিকে গ্রাহ্য করে অথবা এমন একটি বাণীরূপ সন্ধান করেন যা ধ্বনির কারণে মূল্যবান, কিন্তু শুধুমাত্র অর্থের মাধ্যমে মূল্যবান নয়। রবীন্দ্রনাথের 'মানসীতে এগুলোর প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। 'মানসী'র কয়েকটি কবিতা-- যেমন 'সুরদাসের প্রার্থনা, 'মেঘদূত', 'আহল্যার প্রতি' 'বধূ' এবং 'নিস্ফল কামনা' রবীন্দ্রনাথের কাব্যগত সত্য আবিস্কারের সফল প্রয়াস।

'সঞ্চয়িতা'য় 'মানসী' থেকে উৎকলিত প্রথম কবিতাটির নাম 'ভুলে'। এই কবিতায় কবি তাঁর একজন মানসীর কথা কল্পনা করেছেন এবং তাকে প্রত্যক্ষে না পাবার বেদনাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে একসময়ে যে আনন্দ এবং সংবর্ধনা জীবনে ছিল আজ তা নেই। কিন্তু পুরাতন মুহূর্তে সেই আনন্দ এবং সংবর্ধনাকে নতুন করে পাওয়া যায় কিনা কবি তা ভাববার চেষ্টা করছেন। পুরোনো স্মৃতিটাও লঘু এবং স্পর্শকাতর, আনন্দে কবি সকালবেলার অর্থাৎ ঊষালগ্নের কুসুম তোলার ঘটনা উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন যে, কুসুম তো এখনো ফোটে এবং তাতে বোঝা যায় যে কুসুমের মাস এখনো আছে। কিন্তু যারা এক সময় কুসুম চয়নে রত ছিল তাদের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই পুরোনো দিনগুলিকে নতুন করে বিকশিত করা যায় না এবং সে কারণেই চিত্তে বেদনা জাগে। কবি এই কবিতায় আমাদের সেই বেদনা উপঢৌকন দিয়েছেন।

কবিতাটি কাব্যকলাকৌশলের দিক থেকে খুব বেশী উল্লেখযোগ্য না হলেও এর মধ্যে বাংলা কাব্যের রোমান্টিকতার লঘু স্পন্দন আমরা অনুভব করি। কয়েকটি উপমার মধ্য দিয়ে কবির ভাবনার চারুতা

প্রকাশ পেয়েছে। কবি স্ফুট অধরকে বেলকুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন, চোখকে শুকতারার সাথে তুলনা করেছেন। এই দু'টি উপমার মধ্যে একটি বিনম্রতা এবং স্পর্শকাতরতা ফুটে উঠেছে। এ-কবিতাটির মধ্যে কবি একটিও যুগ্মব্যঞ্জন ব্যবহার করেননি যার ফলে কবিতাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং লঘু হয়েছে। ছয়মাত্রার চালে সমস্ত কবিতাটিকে বিন্যস্ত করেছেন। মাত্রাবিন্যাসের রীতিতে কবির একটি অনায়াস-কুশলতা রক্ষা করা যায়। 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটি একই ছন্দে বিন্যস্ত। এখানেও মাত্রাবৃত্তে ছয়মাত্রার চাল ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে অবশ্য কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—বন্ধন, বসন্ত, জ্যোৎস্না, মর্ম। তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রবল কোন ঝোঁক এই কবিতাটিতে ধরা পড়েনি। এখানকার ভাবটিও পূর্বের কবিতাটির মত। মূলতঃ এই কবিতা দু'টিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা না করে ছন্দপরীক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করা ভাল। ভাবটা নিছক কাল্পনিক এবং এক-প্রকার গৌণ বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে 'ফ্যান্টাসী' বলে একটা কথা আছে এখানে সেই রোমান্টিক 'ফ্যান্ট্যাসী'র সলজ্জ পদচারণ আমরা লক্ষ্য করি। 'বিরহানন্দ' কবিতাটি সাতমাত্রার চালের একটি অনুপম নিদর্শন। প্রতি চরণে সাত সাত করে দুটি পর্ব এবং এভাবে ছয় চরণের একটি করে স্তবক তৈরী হয়েছে। মোট ৮টি স্তবকে তিনি সাত মাত্রার চালকে বিলম্বিত করেছেন। বাংলা কবিতার জন্য এটা নতুন। মনে হয় কবি এই সাত মাত্রার চালটিকে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করবার জন্য সমগ্র কবিতাটিকে রচনা করেছেন। এখানেও সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে দু'মাত্রার অধিকার দিয়েছিলেন। এই পরীক্ষাটি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে প্রথম ধরা পড়ে। কিন্তু সে পথে অগ্রসর হওয়ার পর্যায়ে যতটা সম্ভব কম সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহার করেছেন। আমরা এতদিন পয়ারের একটি চরণে অসম মাত্রার দু'টি পদের বিন্যাস পেতাম। এই অসম মাত্রার পদ বিন্যাস ছিল আট এবং ছয় মাত্রার। এতে চরণে একটি গম্ভীরতা এবং ধীর লয় সৃষ্টি হতো। রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দ মাত্রাকে সাত সাত মাত্রায় দোলায়িত করে একটি নতুন হিল্লোল সৃষ্টি করলেন যা তৎকালীন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন এবং বিস্ময়কর। একই ছন্দে 'ক্ষণিক মিলন' কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। বাংলা কবিতায় মাত্রার এই ভঙ্গীটি পরবর্তীতে আর ব্যবহৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথও তার পরীক্ষাটি

এখানেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। মাত্রার চালের পরীক্ষার দিক থেকে এই ছন্দের একটা মূল্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবের সহজ প্রকাশ এই ভঙ্গীতে আড়ষ্ঠ হয়। এখানে প্রতিটি চরণ চৌদ্দ মাত্রার সমান পর্বে বিলসিত থাকায় ভাবটি অগ্রসর হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ সৃষ্টি করতে গিয়ে এটা বুঝেছিলেন বলে মনে হয়। কেননা 'বিরহানন্দ' কবিতাটির নামের নীচে পাঠকের প্রতি কবির নিবেদন লক্ষ্যযোগ্য। কবি বলছেন, "এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক।"

'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমুদ্রের যে সমস্ত বর্ণনা আছে সে বর্ণনাধারার প্রথম কবিতা। বাংলা কবিতায় সমুদ্রের উপমা অসাধারণ দীপ্তভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে সমুদ্র রাবণের চিত্ত-বিক্ষোভের রূপক হিসাবে আমাদের অনুভূতিতে গ্রাহ্য হয়। রাবণ সমুদ্রের তরঙ্গকে দেখে আপন হৃদয়ের আর্তনাদ এবং ক্ষোভকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নতুন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমুদ্র প্রেরণা হিসাবে অনুপস্থিত। তবে সমুদ্রের বর্ণনা তাঁর অনেক কবিতায় এসেছে। 'সিন্ধুতরঙ্গ' ঠিক তেমনি একটি বর্ণনা। 'দেবতার গ্রাস' কবিতাতেও সমুদ্রের একটি বর্ণনা আছে। 'মানসী'র এই বর্ণনাটি পুরীতীর্থ যাত্রীর একটি তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে রচিত হয়েছিল। এই কবিতাটি পয়ার ছন্দে রচিত। এখানে প্রতিটি পদের মাত্রার চলন-বিন্যাস এ-রকম—৮।৮।৬।। ৮।৮।৬।। ৮।৮।৮।৬।। ৮।৮।৮।৬।। ৮।৮।৬।। ৮।৬।। ।

'নিস্ফল কামনা' কবিতাটি কবির কাব্যশক্তির একটি পরিণত প্রকাশ সুস্পষ্ট করে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই কবিতাটিকে ভাব এবং ছন্দের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দেয়া যায়। 'নিস্ফল কামনা' কবিতাটি অসম পঙ্‌ক্তির পয়ারে রচিত। এই কবিতাটির ছন্দ, গতি, ভাবাবেগের বিপুলতা অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক পরে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'নিস্ফল কামনা'র ছন্দ আরো তীব্র, গতিময় করেছিলেন। 'নিস্ফল কামনা'র আরম্ভটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।

সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে
বহে কি না বহে
বিদায় বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি-আঁখি মাঝে॥

কবিতাটিতে ভাবের অব্যক্ততা প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ চোখের একটি উপমা এনেছেন। বলছেন, "অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে বিজন তারার মাঝে স্বর্গের আলোকময় অসীম রহস্য যেমন করে কাঁপে তোমার নয়নের নিবিড় তিমির তলে তেমনি আত্মার রহস্য শিখা কাঁপছে।' এখানে কিন্তু নয়নকে আমরা চাক্ষুষ করতে পারছি না, সুস্পষ্টভাবে বুঝতেও পারছি না কিন্তু রহস্যমদিরতার আভাস পাচ্ছি। এই অব্যক্ত-তাই কবিতাটিকে মাধুর্য দিয়েছে এবং রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মাণে সাহায্য করেছে। রোমান্টিক কবি কীট্স তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, "তুমি সকল উজ্জ্বল চক্ষুকে প্রাণবন্ত করেছো।" এখানে চক্ষুর বর্ণনা নেই কিন্তু চক্ষুর রহস্যময়তা অভিব্যক্ত হয়েছে, এভাবে রোমান্টিক ভাবালুতার মধ্যে আমরা অব্যক্তের একটি রহস্যঘন প্রকাশ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে সেই অব্যক্তের প্রকাশ ঘটেছে। 'মানসী'র 'নারীর উক্তি' এবং 'পুরুষের উক্তি' কবিতা দু'টি সাধারণ প্রথাগত রচনা, এমন কোন বিশিষ্টার্থক নয় তবে 'বধূ' কবিতাটি একটি সুন্দর পরিণত ভাবপ্রকল্পের প্রকাশ বহন করছে। কবিতাটি একটি গল্পের মত। গ্রামীণ পরিবেশে একটি বালিকাবধূর স্বজন-বান্ধবীহীন নির্জনতার বেদনাকে কবি গ্রাম্য পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব মমতায় প্রকাশ করেছেন। এ কবিতার মধ্যে গ্রামের গাছপালা, গৃহাঙ্গন, মেঠো পথ, নিস্তরঙ্গ পুকুর, ধূ ধূ মাঠ এবং বাঁশবনের সুন্দর বর্ণনা আছে। গ্রাম্য পরিমণ্ডলের একটি মেয়ে নগরের অনভ্যস্ত জীবনে তার শৈশবের গ্রামের কথা ভাবছে। সেই ভাবনার মধ্যে অসহায়তা, বেদনা এবং করুণ আর্তস্বর ধরা পড়েছে।

মানসী-পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয় মাত্রার পর্বের গতিময়তার উপর নির্ভর করে এ-কবিতার ভাবব্যঞ্জনা প্রসারিত হয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির বর্ণনা কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। শব্দবিন্যাসের ধ্বনিগত সাম্যের কারণে ছন্দ গতি পেয়েছে এবং কবিতাটি দীর্ঘ হলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি সহজসাধ্য হয়েছে। কবিতাটির বক্তব্য হচ্ছে যে, যথার্থ প্রেম নয়নে থাকে না হৃদয়ে থাকে। নয়ন দেহকে লক্ষ্য করে এবং দেহকে কাম্য করে। তাই কামনার নির্বাচন নয়নের সাহায্যে ঘটে থাকে। কিন্তু হৃদয়ে যে প্রেমের স্থিতি সে প্রেম চিরকালীন, তার কোন বিলয় নেই। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে মাথুরের পদগুলো সবচেয়ে মধুর এবং সর্বাপেক্ষা বেদনাভারাক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন এবং রাধিকার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ মিলনের অন্তরায় ঘটলো তখন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা আরম্ভ করলেন। দেহ কামনাকে অস্বীকার করে ইন্দ্রিয়-অতিক্রান্ত একটি প্রেমের ভরসা তিনি পেলেন। এই ভরসার মধ্যেই প্রেমের সফলতা এবং সার্থকতা।

হিন্দী-অবধী সাহিত্যে 'কৃষ্ণ-কাব্যে' ভক্তি পরম্পরায় সুরদাস সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয় কবি ছিলেন। সুরদাসের সময়কাল ১৪৮৩ থেকে ১৫৮৫ পর্যন্ত ধারণা করা হয়। বৈষ্ণব মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের সময়কালে সুরদাসের আবির্ভাব। সুরদাস গায়ক ছিলেন, তিনি লীলাগান করতেন এবং অন্ধ ছিলেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না, কেননা তাঁর রচনার মধ্যে দৃশ্যমান প্রকৃতির সঙ্গে যে বর্ণনা আছে চক্ষুষ্মান ছাড়া কেউ তা বর্ণনা করতে পারে না। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ স্পষ্ট উল্লেখ করতে পারেন নি কি অবস্থায় সুরদাস অন্ধ হয়েছিলেন। সুরদাসের অন্ধত্ব নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তারই একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতাটি লিখেছেন। কাহিনীটি হচ্ছে যে সুরদাস সম্ভোগের লিপ্সায় কাম-দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়তমাকে অবলোকন করেছিলেন। এ-কারণে তাঁর মনে অনুশোচনা জাগে এবং তিনি নিজের দু'চোখ অন্ধ করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির শেষে এই তত্ত্বটি নিম্নভাবে ব্যক্ত করেছেন:

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ—
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।

বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিবে
অনন্ত বিভাবরী।

এই কবিতার মধ্যে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনাটি বাংলাদেশের নিভৃত পল্লী অঞ্চলের, এখানে গগনের উদারতা চোখে পড়ে, শ্যামল কাননতল চোখে পড়ে এবং নদীর জল স্বচ্ছ মনে হয়। যেখানে সন্ধ্যার আকাশ বিবিধ বর্ণে উজ্জ্বল হয় এবং রাত্রির আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র মানুষকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ এই বর্ণনার মধ্যে পূর্ণ বর্ষার কথা বলেছেন আবার শরৎ-কালের আকাশে ইন্দ্রধনুর উদয়ের কথা বলেছেন। প্রকৃতির এই আকর্ষণ একমাত্র বঙ্গভূমিতেই আছে। 'মানসী'-এর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বঙ্গের পল্লী-প্রকৃতির সমর্থন পাওয়া যায়।

'ভৈরবী গান' কবিতাটি ছন্দ-লালিত্যে মধুর এবং সেভাবেই তাকে বিচার করব, ভাবের দিক থেকে নয়; ভাবটি এখানে মানসিকী। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি গীতিকবিতার একটি উজ্জ্বল এবং সফল নিদর্শন। ইংরেজ কবি কীটসের কবিতায় 'ওড' শ্রেণীর যে কবিতা আছে তার সঙ্গে এ কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কীটসের 'ওড টু অটাম' কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের উপর কীটসের কিছু প্রভাব আছে এটা আমরা পরবর্তী কিছু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটিতে বর্ষার বর্ণনা মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে—বর্ষার কারণে কবির মানসপ্রতিক্রিয়া। তিনি বলছেন যখন বর্ষায় প্রেমিক-প্রেমিকা নির্জনে অবস্থান করে তখন তাদের নির্জনতা ভঙ্গ করবার জন্য নিকটে কেউ থাকে না। আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরতে থাকে এবং তখন মনে হয় সমাজ-সংসার এবং জীবনের কলরব সব-কিছুই মিথ্যা, একমাত্র সত্য হচ্ছে নয়ন দিয়ে নয়নকে অনুভব করা। এই নির্জনতার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যের সান্নিধ্যে অবস্থান

করে। বৃষ্টিপাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দগুলো উচ্চারণ করবে সেগুলো দু'টি হৃদয়ের উদ্বেলতাকে প্রকাশ করবে। অন্য সময় যে সব কথা উচ্চারণ করতে সংকোচ হয় বর্ষার দিনে তা সহজেই উচ্চারণ করা যায়। এই কবিতাটি বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রেমভিলাষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিতাটির ছন্দের গতি লঘু এবং চঞ্চল কিন্তু একটি জায়গায় কিছুটা দুর্বলতা আমাদের কানে বাজে। 'বলিতে বাজিবে না নিজ কানে, চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে'—এখানকার মিলটি অত্যন্ত দুর্বল।

'মানসী'র অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে—'মেঘদূত' এবং 'অহল্যার প্রতি'। 'মেঘদূত' কবিতাটিতে কালিদাসের ভাষ্যকে আমরা নতুন করে উচ্চারিত হতে দেখি। এই কবিতাটিও 'ওড' জাতীয়, কালিদাসকে লক্ষ্য করে কবির বেদনা-বিলাস। কালিদাসের ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে কবি শ্যামল বঙ্গদেশের বর্ষার অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন:

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া॥

তৎসম শব্দের রসঘন প্রাচুর্যে এবং অন্তযমক বিদ্যমান রেখে ভাবের প্রবহমানতা নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় একটি নতুন ভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন। এই ভঙ্গীটি বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন ছিল। সন্তর্পণে পয়ারের আট-ছয় চাল রক্ষা করে বক্তব্যকে চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত করে রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্ময়কর সুরঝংকার সৃষ্টি করেছেন যা বাংলা কবিতার জন্য নতুন এবং আকর্ষণীয় একটি ভঙ্গী।

আমরা ক্রমশঃ লক্ষ্য করছি যে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করছেন এবং সেই শব্দগুলো নতুন প্রাণময়তায়

প্রকাশিত হচ্ছে। যাকে আমরা কবিতার সত্য বলি 'অর্থাৎ বক্তব্যকে যথাযথভাবে বহন কোরবার' অধিকার, সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি-সম্পর্কে কবির একটা বিশেষ অনুভূতি আছে যে-অনুভূতির প্রকাশ আমরা 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় দেখব, তারই সূচনা আমরা 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিতে লক্ষ্য করি। এই কবিতাটি 'মানসী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় বিশ্ব-প্রকৃতি জড় এবং নিশ্চল নয়। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিপুল প্রাণপ্রবাহ রয়েছে। সেই প্রাণপ্রবাহ পাষাণরূপী অহল্যাকে স্পর্শস্বাদ দিয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাণ-স্পন্দন সুপ্ত রয়েছে তারই সঙ্গে পাষাণী অহল্যার মিলন এ-কবিতার মূল সুর। বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মানব-অনুভূতির একাত্মতা এই কবিতাটিকে মূল্য দিয়েছে। পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করব যে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যধারায় এই অনুভূতি সক্রিয় রয়েছে। এই কবিতাটির ছন্দ 'মেঘদূত'-এর সঙ্গে সমার্থক। অন্তঃমিল-সহ এক চরণ থেকে অন্য চরণে গতিময়তা এ-ছন্দের বিশিষ্টতা। তাছাড়া তৎসম শব্দের রুচিবান বিন্যাস এবং ধ্বনিগত সুষমা এ-কবিতাটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।

আমরা পূর্বেই 'মানসী'র ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র ছন্দ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নতুন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল। ...তার আগে বাংলা কবিতায় এসব ছন্দের আমদানি হয়নি...ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আহ্বান করে তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হল। এমনি করে কাব্যে গাম্ভীর্য ও সরসতার প্রতিষ্ঠা ঘটল। ...মানসী রচনার সময় আমি ছিলেম গাজিপুরে। গোলাপের জন্য গাজিপুর বিখ্যাত। ...সে সময় কতরকম ছন্দ গুঞ্জরিত হয়েছিল আমার মাথায়। এইসব ছন্দের লীলাভূমি হচ্ছে সাংসারিক বিষয়। কিন্তু তবু বিষয়টা হচ্ছে গৌণ, বলবার ভঙ্গীটাই হচ্ছে আসল। গোলাপের প্রতি টানটা শেষ পর্যন্ত একটা মনের আনন্দে পরিণত হল, তার অনির্বচনীয়তায় ভরে উঠলো মানসীর ছন্দসাজি।"

'মানসী' সম্পর্কে আমরা সামগ্রিকভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। যেমন,

প্রথমত : 'মানসী' থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কণ্ঠস্বর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

দ্বিতীয়ত : 'মানসী'তে শব্দ ব্যবহারের এবং ছন্দের পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। দেশজ চলিত ভঙ্গী এবং তৎসম ভঙ্গী উভয় প্রকারের পরীক্ষার উন্মেষ 'মানসী'তে রয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার এবং মাত্রাবৃত্ত এ উভয় বৃত্তের ছন্দের গতিপ্রবাহের পরীক্ষা আছে।

তৃতীয়ত : বঙ্গভূমির গ্রামীণ প্রকৃতির চরিত্র 'মানসী'তে প্রথম উন্মোচিত হয়েছে।

চতুর্থত : বিশ্বপ্রকৃতি যে জড় এবং নিশ্চল নয় বরঞ্চ প্রাণস্পন্দনে স্পন্দমান এবং মানবপ্রকৃতির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত, রবীন্দ্রনাথের এই বোধ প্রথম অঙ্কুরিত হয় 'মানসী'তে।

পঞ্চমত : বৈষ্ণবীয় প্রেম এবং আরাধনা যা রবীন্দ্রনাথকে সর্বদাই আকর্ষণ করেছে, তারও পরিচিতি 'মানসী'তে স্বাক্ষরিত।

ষষ্ঠত : প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং নির্ভরতা রবীন্দ্র-কাব্যকে লাবণ্যময় এবং মহার্ঘ করেছিল সে-প্রবৃত্তির উন্মেষও 'মানসী'তেই প্রথম লক্ষ্য করি।

তিন

[সোনার তরী]

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি নিয়ে এক সময় বাংলা সাময়িক সাহিত্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে: শুধুমাত্র চিত্রকল্প হিসাবে না দেখে লোকেরা এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে ব্যগ্র হয়েছে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ

করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্যফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে—ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা কোথায়? 'তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।"

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'সোনার তরী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'মানসী'র অধিকাংশ কবিতা তিনি লিখেছিলেন পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। তখন নতুনের স্পর্শ তাঁর মনের মধ্যে নতুন স্বাদের উত্তেজনা জাগিয়েছিল এবং সেখানে নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের পরীক্ষা তিনি করেছিলেন। নতুনত্বের মধ্যে একটি বিস্ময় আছে, একটি অসীমত্ব আছে, কবির মন তাতে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু 'সোনার তরী' তিনি লিখেছিলেন অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্ব তাকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষায়—"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরে পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার

জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য-সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।"

এ-সময় কবি জমিদারী তদারক উপলক্ষে বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিশর, সাজাদপুর প্রভৃতি গ্রামে আনন্দময় অবকাশ কাটিয়েছেন এবং এভাবে এদেশের পল্লীজীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, গভীর দৃষ্টি দিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। রাত্রিবেলা জ্যোৎস্নালোকে পদ্মার শুভ্র বালুচর দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে পদ্মার তীব্র জলোচ্ছ্বাস দেখেছেন এবং প্রকৃতির বিপুল বর্ণচ্ছটা তাঁর কল্পনাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটি আনন্দবন্ধন তিনি অনুভব করেছেন। ছিন্নপত্রে এ-সময়কার অনুভূতির অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। একটি পত্রে তিনি বলছেন, "অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচরব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে। সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তা হলে কী একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকে পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটা বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি।"

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি নিয়ে নানাবিধ বিশ্লেষণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথও নিজের একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কবিতাটির সহজ তাৎপর্য হচ্ছে যে মানুষ পৃথিবীতে কর্মময় জীবন-যাপন করে এবং প্রত্যেক মানুষ তার জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে কিছু না কিছু দেয়। মানুষের এই অজস্র কর্মের ফল পৃথিবীকে শোভন করে, সমৃদ্ধ করে এবং অগ্রবর্তী করে। কিন্তু এই কর্মগুলো অথবা কর্মের ফলগুলো পৃথিবীতে থাকলেও কর্মের দায় যার ছিল সেই মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে থাকে না। মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রবাহ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে থাকে না। বিশ্বজগতের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে মানুষের

কর্ম সফলতা থাকে কিন্তু মানুষ থাকে না। এটাকে মানুষের জীবনের একটি বড় ট্রাজেডী বলা যায়। কিন্তু এই ট্রাজেডীটাই জীবনের চরমতম সত্য। মানুষ অহংকে তার কীর্তির সঙ্গে স্থায়ী অস্তিত্বে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাকালের প্রবাহে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়, শুধু বেঁচে থাকে মানুষের কীর্তিগুলো। এছাড়া আরেকটি ব্যাখ্যা খুঁজে পওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, ঘনঘোর বর্ষাকালে একটি পরিপূর্ণ ভরাট নদীর বুকে সঞ্চিত ধান নিয়ে দ্রুত ধাবমান নৌকো মানুষের প্রাণে যে আকুলতার সঞ্চার করে সেই আকুলতার সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা এখানে মিলিত হয়ে একটি করুণ রাগিনী সৃষ্টি করেছে।

স্বল্প পরিসরের এই কবিতাটিতে বর্ষাকালের পল্লীর একটি সুন্দর সজল এবং মনোজ্ঞ চিত্র আছে। এখানকার চিত্রটি জলরংগে আঁকা একজন নিপুণ চিত্রকরের কলাকৌশলকে প্রকাশ করে। 'সোনার তরী'তে যে চিত্র তিনি এঁকেছেন সে চিত্রটি গ্রাম বাংলার একটি ল্যান্ডস্কেপ। এখানে দিগন্ত আছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আছে, বর্ষার উদ্বেলিত নদী আছে এবং একান্ত নৌকোয় একজন মানুষ আছে। আলো-আঁধারের অস্পষ্ট প্রহেলিকায় এটি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ সাদা-কালোয় একটি চিত্র এঁকেছেন, অন্য কোন রং ব্যবহার করেননি। 'তরুছায়ামসী-মাখা' এই শব্দটির দ্বারা চিত্রের সাদা-কালো বর্ণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এখানে 'সোনার তরী' কথাটি আছে বটে কিন্তু স্বর্ণবিভার উল্লেখ নেই। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় 'অর্ণব তরণী' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এটাই 'সোনার তরী'তে রূপান্তরিত হয়েছে। বিহারীলালের একটি গানেও 'সোনার তরী' কবিতাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে 'সোনার তরী' কথাটি ব্যবহার করে পাঠককে হতচকিত করতে চেয়েছিলেন, সে যুগের এ সমালোচনাটি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। যে চিত্রটি 'সোনার তরী'তে আছে সে চিত্রটি বর্ষার পদ্মা নদীর একটি স্বাভাবিক দু'কূলপ্লাবী চিত্র। জলভারানত কালো মেঘ আকাশে পুঞ্জীভূত, দিগন্তে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে। ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকো হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। এই দৃশ্যটাই আমরা সোনার তরী কবিতাটিতে পাই।

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে একটি নতুন কাব্যলোকে উত্তীর্ণ করে দিল। এই কবিতাটিতে শব্দের উপর কবির পূর্ণ অধিকারবোধ লক্ষ্য করি, চিত্ররূপের পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করি এবং রূপকব্যঞ্জনা নির্মাণে সফলতা লক্ষ্য করি। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ এখানে সুস্পষ্ট-ভাবে উচ্চকিত। পূর্ববর্তী কোন কবির অনুকরণ এখানে নেই, রবীন্দ্র-নাথ এখানে স্বমহিমায় ভাস্বর। 'সোনার তরী' ছাড়া এই কাব্যগ্রন্থে আরও অনেকগুলো রূপক কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই কবিতা গুলো হচ্ছে—'পরশপাথর', 'দেউল', 'আকাশের চাঁদ', 'দুই পাখি' এবং 'ঝুলন'। 'হিং টিং ছট' কবিতাটিকেও ইচ্ছা করলে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'পরশপাথর' কবিতাটিতে কবি বলতে চেয়েছেন যে সত্য সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত তাকে প্রতিদিনের কর্মে এবং আনন্দের মধ্যে আবিষ্কার করতে হয়। প্রতিদিনের কর্মধারায় এবং আনন্দের পর্যাপ্ত উপকরণের মধ্যে সত্য নিহিত থাকে। যে ব্যক্তি সচলভাবে স্বাভাবিকভাবে এবং ঐকান্তিক সততায় জীবনকে গ্রহণ করে সেই-ই সত্যকে পায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি সত্য থেকে বঞ্চিত হয় যে জীবনকে অস্বীকার করে একটি অন্ধ প্রথাগত সাধনায় লিপ্ত থেকে প্রতিদিনের শোভা ও সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ একজন ক্ষ্যাপার রূপক দিয়েছেন, যে সংসারের দিকে পিছন ফিরে সংসারকে অস্বীকার করে সমুদ্রতীরের নুড়ির মধ্যে পরশ পাথর সন্ধান করে ফিরছে। সে তার অজ্ঞাতে পরশ-পাথর স্পর্শও করেছিল কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারেনি। কেননা সে একটি সাধনার প্রথার মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিল, চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেনি। কবিতাটি রূপকের ব্যাখ্যা ছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনার দিক থেকে একটি অপূর্বচিত্র। এখানে সমুদ্রের একটি বর্ণাঢ্য বিবরণ আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রের বিচিত্র বিভঙ্গ কবি বর্ণনা করছেন। সমুদ্রের তরঙ্গিত অগাধ বিপুলতাকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টি ছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্বগগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা
সে-ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি মহা গাঁথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে কেহ কাঁদে কেহ হাসে
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর॥

'দেউল' কবিতায় কবি বলতে চাচ্ছেন যে যখন মানুষ নির্জন নিভৃতে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সতীব্র অবস্থায় নিয়ে যায়। এমন সময় যদি হঠাৎ একটি সংশয় বজ্র সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন অকস্মাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলো এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করবে। সেই অধিকারটা যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার দৃষ্টি। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত অধ্যাত্মসর্বস্থ বিশ্বজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মসাধনার বিরোধিতা করেছেন। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটি 'পরশপাথর'-এর ভাবটাকেই নতুন করে প্রকাশ করেছে। এ কবিতার বক্তব্য হচ্ছে অনায়াসলব্ধ সহজ এবং অকৃত্রিম আনন্দের মধ্যে মুক্তির অশেষ স্বাদ রয়েছে। 'দুই পাখি' কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়ার বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশী যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইতো। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই

খড়ির গণ্ডি (ভৃত্য শ্যামের আঁকা) মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহিরে এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।”

‘ঝুলন’ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে যে বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমোট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন তেমনি প্রাত্যহিক অভ্যাসের একটানা আবৃত্তিতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে-বিপদে, বিদ্রোহে-বিপ্লবে, অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়। কবি বলেছেন যে, তাঁর অন্তরতম সত্তা যদি আলস্যে-আবেশে-বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে নির্দয় আঘাতে তার অসারতা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই কবির নিগূঢ় আপনাকে তিনি নিবিড় করে পাবেন। এবং সে পওয়াতেই তাঁর আনন্দ। ‘হিং টিং ছট্’ কবিতাটি একটি বিদ্রূপ রসাশ্রিত রূপক। কবি স্বদেশপ্রেমের ভেজাল দিকটার দিকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন। সবকটি রূপক কবিতাই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীমূলক করেছেন এবং কাহিনীগুলো নিজস্ব গল্পভঙ্গীতে আকর্ষণীয়।

‘সোনার তরী’র ‘আকাশের চাঁদ’ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ শ্যামল, সুনীল এবং স্বর্ণাভ হরিৎবর্ণের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন:

এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।

‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শব্দব্যবহারের অসাধারণ কুশলতার মধ্যে আবিষ্কার করি। তিনি দেহস্পর্শের অনেক অনুভূতি

শব্দে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কবি কীটস যেমন শরীরী অনুভূতিকে বিস্ময়কর কুশলতায় শব্দে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি হৃদয়ের অনুভূতিকে শব্দে বহমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কীটসের কবিতার ক্ষেত্রে 'সেনসুয়াসনেস' কথাটি ব্যবহার করা হয় যার অর্থ হচ্ছে শরীরী, স্পর্শ বা স্বাদের অনুভূতি শব্দে প্রকাশ করে। এর ফলে কীটসের কবিতায় উষ্ণ অলংকার কথাটি পাচ্ছি, শীত সকালে নিঃশ্বাসের কুয়াশায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ার কথা পাচ্ছি, কড়াঙ্গুলিতে গোলাপের পাপড়ির বেষ্টনের কথা পাচ্ছি, সুগন্ধিত অন্ধকারের বিবরণ পাচ্ছি। এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে দিয়ে আমরা যে অনুভূতিকে বর্ণিত হতে দেখি সে অনুভূতিকে দেহস্পর্শজাত অনুভূতি বা সেনসুয়াসনেস বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। 'হৃদয়যমুনা' কবিতাটিতে কবি যৌবনবতী রমণীর নিরাবরণ শরীরে তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের স্পর্শের কথা বলেছেন। এ বর্ণনায় আমরা তরঙ্গকে নয় যুবতী দেহকে অনুভূতির আয়ত্তে পাই। উদাহরণস্বরূপ :

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে ॥
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি নিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে—
ঘরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে ॥

আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের এই রূপক কবিতাগুলি লক্ষ্য করি তখন অনুভব করি যে তিনি তাঁর সময়কালের অভিপ্রায় ও জিজ্ঞাসাকে উপস্থিত করেছেন। একটি বর্ণনা বা বিবৃতির অন্তরালে আমরা যে উপলব্ধিকে পাচ্ছি বর্ণনাটি বা বিবৃতিটি দৃশ্যত সে উপলব্ধির কথা বলে না। তা হয়তো একটি বিবরণ বলে বা কাহিনী বলে। কিন্তু বিবরিত কাহিনী বা বর্ণনার অন্তরালে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ পন্থাকে

প্রস্ফুটিত হতে দেখি। এক সময় বাংলা সাহিত্যে রূপক ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিবর্ণীকরণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে সে রূপক তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের অথবা ভয়ের অথবা আনন্দের অথবা আগ্রহের প্রতিবর্ণীকরণে গড়ে উঠলো। বৈষ্ণব কবিতার কথাটি ধরা যাক না কেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের যে মহার্ঘতা এবং অনন্যসাধারণত্ব তা কিন্তু লৌকিক প্রেম নয়—তা হচ্ছে জীবাত্মা-পরমাত্মার কথা। বৈষ্ণব কবিকূল বৈষ্ণব পদাবলী নির্মাণ করেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এই সমস্ত কবিতাবলী প্রেমের কবিতা বলে মনে হয় যেখানে পুরুষ এবং রমণী পরস্পরকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হচ্ছে কখনো বিচ্ছেদে বিমূঢ় হচ্ছে আবার মিলনে উচ্চকিত হচ্ছে। কিন্তু মূলতঃ এগুলো বৈষ্ণব সাধনতন্ত্রের রূপকগত ব্যঞ্জনা মাত্র। পদগুলোর বর্ণনায় পুরুষ এবং রমণীর পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, আকুলতা 'এবং কামনার অধৈর্য মনোবৃত্তি অথবা মিলনের উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাতে আমরা শব্দগত ব্যাখ্যায় প্রেমের কবিতাকেই অবশ্য পাই। কিন্তু মূলত এগুলো হবে জীবাত্মা-পরমাত্মাগত তত্ত্বজিজ্ঞাসার বিচিত্র অনুসন্ধান। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন যে বৈষ্ণব গান কি শুধু বৈকুণ্ঠের জন্যই। এর মধ্যে কি মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ নেই? নর-নারীর বিচিত্র বেদনা এবং হতাশা ও চিত্ত-বিভ্রমের হেতু নেই? রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীকে তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছেন। তিনি ভাবতে চেয়েছেন যে এগুলোতে তত্ত্ব আছে ঠিকই কিন্তু যে কবিরা এসব তত্ত্বের রূপগত সিদ্ধান্ত নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত প্রেমের অনুষঙ্গে এগুলো রচনা করেছিলেন।

'মানসসুন্দরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভুবনে একটি নতুন প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মোচন করে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-কল্পনার একটি নতুন বিশ্বাসকে এ-কবিতায় প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীতে সৌন্দর্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বিশ্ব-ভূ-মণ্ডলের সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে বিপুল সৌন্দর্যরাশি প্রতিনিয়ত সচকিত ও আলোড়িত। রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্যরাশিকে তার হৃদয়ের একান্ত নিকটে পেতে চান। কিন্তু ইন্দ্রিয়গাহ্যতার মধ্যে সৌন্দর্যকে তিনি পুরোপুরি সম্ভোগ করতে পারছেন না। তাই তিনি আপন মানসলোকে সম্মোহিত কল্পনায় একটি অনিন্দ্যসুন্দরী নারীমূর্তি গড়ে তুলেছেন এবং সে নারীর সঙ্গে নিজের এক প্রেমের সম্পর্ক

স্থাপন করেছেন। এখানে কল্পনা এবং বাস্তব অপূর্বভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে, রূপ ও অরূপ এবং ভাব ও ভাষার এই অপূর্ব সমন্বয় কবির 'মানসসুন্দরী' কবিতায় ঘটেছে যা বাংলা সাহিত্যে নতুন। কবি বিহারীলালের কাব্যে একটি মানসমূর্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন'-এ। কিন্তু সে দুটি কাব্যগ্রন্থে মূলতঃ দেবী সরস্বতীর বন্দনা ঘটেছে। অবশ্য কবি দেবী সরস্বতীকে আপন গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ভাবটি আরও অধিক কল্পনার লীলাচাপল্যে সচকিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ কবি শেলীর ভাবপ্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়। শেলী তাঁর 'এপিসাইকিডিয়ান' এবং 'আলআস্টার' কবিতা দু'টিতে অনন্ত সৌন্দর্যের বন্দনা করেছেন যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য। সেই অনন্ত সৌন্দর্যকে বাস্তবদেহী রমণীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেহধারিণীর মধ্যে যখন সে সৌন্দর্যকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি তখন তাঁর মনের মধ্যে বেদনা জেগেছে। এই বেদনাও সৌন্দর্যকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী তাঁর যুগযুগান্তরের প্রেয়সী আবার এই মানসসুন্দরী তাঁর জীবনের বিশেষ করে কাব্যভুবনের পরিচালিকা শক্তিও বটে। 'মানসসুন্দরী'র সূত্রপাতে কবি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে মানসসুন্দরী হচ্ছে তাঁর 'আজন্ম সাধনধনসুন্দরী আমার, কবিতা কল্পনালতা।' 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে জীবনদেবতার যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি তার আভাস আমরা 'মানসসুন্দরী' কবিতাটিতে পাই। 'মানসসুন্দরী' কবিতাটির বিস্তার অত্যধিক। এতটা বিস্তারের প্রয়োজন ছিল না। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে এবং ক্রমশঃ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে এই বিস্তারগুলি কমে এসেছে আমরা দেখতে পাব। তবে মানসসুন্দরীর অতিভাষণ পীড়ায় দেয় না তার কারণ এই কবিতার অপূর্বসুন্দর গতি-প্রবাহ। এর ছন্দের একটি বহমানতা আছে অন্ত্যযমক থাকা সত্ত্বেও কণ্ঠ-যতির স্থাপনা চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত হয়েছে, যার ফলে একটি দীপ্ত প্রবহমানতা নির্মিত হয়েছে। এই প্রবহমানতাই কবিতাটির প্রাণ।

'বসুন্ধরা' 'সোনার তরী'র একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। আমরা জগৎ সীমানার মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ। এভাবে আবদ্ধ থেকে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে একটি আসক্তির সম্পর্ক গড়ে তুলি। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর

এই আসক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-ধারায় এই আসক্তি একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তিনি বলতে চান যে জননী বসুন্ধরার সাথে তাঁর যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের এবং সে সম্পর্ক দেশ-কালের অতীত। কবি এ-কবিতার মধ্যে বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে তার নিজের প্রাণের একটি সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর জীবনরস পরিপূর্ণভাবে পান করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। এই পৃথিবীর জীবন নানারূপে অভিব্যক্ত—মৃত্তিকারূপে, বৃক্ষ-লতারূপে, প্রাণীরূপে এবং মানুষরূপে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত অব্যক্তভাবে যে জীবনপ্রবাহ বিদ্যমান তাকেই কবি নিজের চিত্তের মধ্যে স্পন্দমান করতে চান। অর্থাৎ কবিচেতনা এবং বিশ্বচেতনা একাত্ম করে তিনি প্রকাশ করতে চান। জীবনসত্তাকে এমন সুন্দর করে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন কবি আমাদের ভাষায় প্রাকাশ করেননি।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে আদিজননী সিন্ধুকে উপলক্ষ করে কবির একটি ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটিতে কবি যে কথা বলেছেন 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রচনায় তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

> এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনাশোনা! বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করচেন তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম। অন্ধ জীবনের গূঢ় পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘননীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করতো। তারপরেও নব নব যুগ এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি। আমরা দু'জনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল' গায়ের উপর টেনে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছি।

সমুদ্র একটি মহাচেতনার মত, সে যেমন জীবকে ভাস্বর করে তেমনি ধ্বংসকেও অনিবার্য করে। সমুদ্রের প্রতাপে এবং নিরন্তর আঘাতে বসুন্ধরা আহত হয় আবার নতুন প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সমুদ্রকে সন্তান-বিয়োগ-ব্যথাতুর জননীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তরঙ্গাঘাতকে বলেছেন মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলতা। এই কবিতায় বায়রনের প্রভাব আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটাকে স্বকীয় করে নিয়েছেন। পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের একটি সম্পর্ক আছে। আবার সমুদ্র ও পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের একটি আত্মীয়তা আছে। এ-আত্মীয়তার সম্পর্কটি কবি এ-কবিতাটিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'সোনার তরী'র একটি দীর্ঘ কবিতা হচ্ছে 'পুরস্কার'। উচ্ছ্বাস এবং অতিরিক্ত অহেতুক বিস্তারের জন্য কবিতাটির ভাবপ্রকল্প সংহত হতে পারে নি। কিন্তু একটি মধ্যবর্তী জীবনের কল্পিত কাহিনীকে অবলম্বন করে কবি কবিতার মূল্যবোধের একটি প্রয়াস পেয়েছেন যে প্রয়াসটি মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয়। কবি বলছেন যে একজন কবির জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবনের অব্যক্ত গভীর অনুভূতিকে সুন্দর প্রকাশ দান করা। এই কবিতাটিতে অনুপ্রাসের আশ্চর্য ব্যঞ্জনা আছে। একটি অন্ত্যানুপ্রাস এখানে উপস্থিত করছি :

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
রেখে যাব সমধুর ৷৷

'বিম্ববতী' কবিতাটি একটি সুন্দর উজ্জ্বল রূপকথা। কবিতাটির বিশিষ্টতা হচ্ছে কবি রাণীর রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনটি প্রাথমিক রঙের ব্যবহারকে আরাধ্য করেছেন। প্রথম স্তবকে নীলরঙের ব্যবহারটি পাই—'নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী'। দ্বিতীয় স্তবকে লাল রঙের ব্যবহার এসেছে—'গোলাপি অঞ্চলখানি, লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।' তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে এসেছে লাল এবং হলুদ রঙ—'ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল, রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল' এবং

পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা নব পীতবাস'। নীল এবং হলুদের ব্যঞ্জনা এসেছে 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে যেখানে 'সুনীল সিন্ধুতীর', 'পাকা ধান' এবং 'সোনার কিরণে'র কথা এসেছে।

'মানসসুন্দরী' কবিতার প্রথম স্তবকে আঠারটি চরণে নব্বইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলো শব্দের পুনরাবৃত্তি আছে। আমরা সমগ্র স্তবকের মধ্যে নাসিক্যধ্বনির একটি আবর্ত লক্ষ্য করি। অনুপ্রাস হিসাবে এবং আভ্যন্তরীণ ধ্বনিগুঞ্জন হিসেবে 'ন' ধ্বনিটি চুয়াল্লিশবার এসেছে। এ-ধ্বনিটি কখনো শব্দের অভ্যন্তরে কখনো অন্তে, কখনো শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে বাংলায় অনুপ্রাস-বন্ধের ক্ষেত্রে 'ন' ধ্বনির ব্যবহারটি প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারটি প্রচলিত প্রথার পোষকতা করে না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ-ধ্বনির একটি স্বাভাবিক প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। করুণা, মমতা, এবং বিপদের প্রস্তাবনা হিসাবে 'ন' এর অনুপ্রাসটি খুবই কার্যকর তা আমরা লক্ষ্য করি। স্তবকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য :

আজ কোন কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবদ্ধ-গ্রন্থগীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব—
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান ক্লান্তি
জীবনের দুঃখ দৈন্য-অতৃপ্তির উপর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর।

'বসুন্ধরা' কবিতাটিতেও 'ন'-এর অনুপ্রাসের অপূর্বসুন্দর লীলাব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। একটি বিনম্র বিস্তারিত নিবেদনের আস্বাদন আমরা এই অনুপ্রাসের সাহায্যে গ্রহণ করি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাভঙ্গি অনন্যসাধারণ। প্রতিটি বর্ণনাকে তিনি চক্ষুগ্রাহ্য সুস্পষ্ট করেছেন। এই সুস্পষ্টতার মধ্যে আমরা একেকটি অঞ্চলের স্বভাব ও আনন্দকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। যেমন: 'বসুন্ধরা' কবিতায় মরুভূমির বর্ণনায় কবি বলছেন, "মরুভূমি হচ্ছে মহাপিপাসার রঙ্গভূমি যেখানকার রৌদ্রালোকে জ্বলন্ত বালিকারাশি সূচের মত তীক্ষ্ম হয়ে চোখে বেঁধে, যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত ধূলিশয্যার উপর জ্বরাতুরা বসুন্ধরা তপ্তদেহ ও উষ্ণশ্বাস নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। সেখানকার অবস্থান শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ এবং নির্দয়।" আবার পার্বত্য-অঞ্চলের বর্ণনায় কবির অসাধারণ নৈপুণ্য ধরা পড়েছে। কবি বলছেন, "চতুর্দিকে শৈলমালা তার মধ্যে স্ফটিক-নির্মল-স্বচ্ছ নীল সরোবর। পাহাড়ের শিখরদেশে খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জ দেখা যায় যাদের দেখে কবির মাতৃস্তনপানরত শিশুর কথা মনে হচ্ছে। দূরের পাহাড়ে শুভ্র হিমরেখা দেখা যাচ্ছে যে রেখা মানুষের দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। হিমশুভ্র পর্বত শিখরকে কবির মনে হচ্ছে নিঃসঙ্গ এবং নিঃস্পৃহ।

এ অঞ্চলে মানুষ নেই এবং রাত্রি যখন আসে তখন ঘুমোবার কোন লোক সেখানে থাকে না। কবির বিবেচনায় রাত্রি শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা-জননীর মত অনিমেষ জেগে রয়েছে।" পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ এভাবেই দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভূমির একটি তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করে সে তাৎপর্যের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন যে পৃথিবীর যে বিচিত্র রূপ আছে সে বিচিত্র রূপকে তিনি অনুভব করতে চান। রাত্রিদিন ও ঋতুচক্রের পরিবর্তনের মধ্যে তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করতে চান, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৈলক্ষণ্যের মধ্যে তিনি জাগ্রত হতে চান। তিনি তাই প্রার্থনা করছেন:

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুল ফল গন্ধরেণু।

'বসুন্ধরা' কবিতায় সমগ্র জগৎ এবং জীবনের প্রতি, এক কথায় বিশ্বভূমার প্রতি কবির আসক্তি অনুভব করা যায়। এই আসক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান পরিচয় ধরা পড়ে। এই আসক্তি কোন দেশকালের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই আসক্তি দেশকালের অতীত, যুগ-যুগান্তরের এবং জন্ম-জন্মান্তরের। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্ত প্রাণবিন্দু রয়েছে যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্ম হয়েছেন। এই কবিতাটি গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত সুন্দর। বিভিন্ন উপকরণ একটি চরম সত্য নির্মাণের জন্য বিস্তারিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি দীর্ঘ কলেবরের হলেও এর দীর্ঘতা পীড়াদায়ক নয়। বিভিন্ন অংশ সুসংহতভাবে গড়ে উঠেছে এবং অবশেষে সকল অংশ একত্রিত হয়ে একটি তাৎপর্যের জন্ম দিয়েছে। সে তাৎপর্যটি হচ্ছে বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে কবিচিত্তের গভীর সংযোগ। জীবন-রস পরিপূর্ণভাবে পান করবার জন্য জীবনের বিভিন্ন উপাদানকে কবি ব্যাখ্যা করেছেন।

'বসুন্ধরা' কবিতায় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের পরিচিতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেই সমস্ত পরিচিতির মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্পন্দমান চৈতন্যকে অনুভব করি। এ চৈতন্য হচ্ছে বিশ্বচৈতন্য। কবি রবীন্দ্রনাথ 'বসুন্ধরা' কবিতায় এ বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে লীন হতে চেয়েছেন।

'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।' এ-কবিতাটি কবির নিজের চিত্তলোকের আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না যে কার আহ্বানে এবং কোন আশায় বা কিসের আশায় রাত্রিদিন কর্মক্লান্ত তিনি চলেছেন। প্রথম কবিতায় কর্মের বোঝা সোনার তরীতে তুলে মহাকাল চলে গেল, মানুষ পড়ে রইলো বিস্মৃতির তীরে। মানুষের জীবনের এই ট্রাজেডী কখনও দূর হবার নয়। মানুষ কখনও নিঃশঙ্ক নয়। 'নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবির অধীর আহ্বান:

'কোথা আছ ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।'

১২৯৮ বাংলা সালের ফাল্গুন মাস থেকে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রচিত কবিতার সংগ্রহ হচ্ছে 'সোনার তরী'। 'সোনার তরী'র সবক'টি কবিতার মধ্যে ভাবের একটি আত্মীয়তা আছে।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের যে'কটি বিশিষ্টতা আমাদের লক্ষ্য-গোচর হয় তা নিম্নে বর্ণিত হল :

১. রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবি-কণ্ঠস্বর 'সোনার তরী'তে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত, 'মানসী'তে যতটা তার চাইতে অনেক বেশী। এ-কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে অনিবার্যভাব আপন পরিমণ্ডলের নির্মাতা হিসাবে পরিলক্ষণ করি।

২. রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনবেদ এ-কাব্যগ্রন্থে প্রবলভাবে অনুভূত এবং সু-উচ্চকিত। জীবনের পরিপূর্ণতা আসে যখন বিশ্ববোধ এবং নিজস্ববোধ সমন্বিত হয়, যখন বিশ্বভূমার চৈতন্যে আপন চেতনালোক সমাদৃত হয়; যখন সকল ক্ষেত্রের ফসল একত্রে আহরিত ও সমাদৃত হয়—এ ভাবটিকে কবি বারবার প্রকাশ করেছেন।

৩. এ-কাব্যগ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর কাব্যের এবং বিশ্বাসের একজন প্রেরণাদাতার কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যে বিশ্বাস এবং অনুভূতি কবিকে অগ্রসরমান করে তার স্বরূপ তিনি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন।

৪. এ-কাব্যগ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্রনাথ শব্দের অর্থগত সীমাবন্ধন ভাঙবার চেষ্টা করেছেন সুনিপুণ কুশলতায় ধ্বনিসাম্যের সাহায্যে, উপমা-রূপকের সাহায্যে। বিশেষ তাৎপর্যের লক্ষ্যে উপনীত হবার সাধনায় শব্দের অর্থগত বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং শব্দকে বিভিন্ন সাদৃশ্যের ইচ্ছায় পরিণত করেছেন।

৫. এ-কাব্যগ্রন্থে ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবল অধিকার সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অন্ত্যযমকের অধিকারকে অধিকতর বিলম্বিত করে তার আকর্ষণীয়তাকে বৃদ্ধি করেছেন, কাব্য-স্তবক বা ভার্স প্যারাগ্রাফ নির্মাণের নিপুণ কুশলতা এ-কাব্যে লক্ষ্য করি এবং পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ছন্দের নিজস্ব দ্যোতনা পর্যাপ্ত-ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে লক্ষ্য করি।